কক্সবাজার এলাকার গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় বৃক্ষ প্রজাতির চারা উৎপাদন ও চাষ পদ্ধতির ম্যানুয়েল

ARANNAYK FOUNDATION
Conserving forests for the future

Food and Agriculture Organization of the United Nations

IOM - OIM

প্রকাশক ও কপিরাইট

আরণ্যক ফাউন্ডেশন
ওয়াসি টাওয়ার (৭ম তলা)
৫৭২/কে, মাটিকাটা রোড (ইসিবি চত্তর)
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬
Web site: www.arannayk.org

" Strengthening the Supply Chain of Planting Materials and Community-Based Reforestation for Landslide Prevention Project - Ukhiya and Teknaf Upazila"

Implemented by
FAO and Arannayk Foundation, Bangladesh

লেখক
মোঃ হারুন-উর-রশীদ
ফরিদ উদ্দিন আহমেদ

প্রকাশকাল
মার্চ ২০১৯

প্রচ্ছদ ছবি
কক্সবাজার এলাকার বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো গর্জন গাছের বাগান ও ঢাকি জামের সৃজিত বাগান।

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মরিয়ম মুক্তি

মুদ্রণে
মুক্তি প্রিন্টার্স
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
মোবাঃ ০১৭১২১৪৫৯১৯
ISBN: 978-984-34-7207-6

কক্সবাজার এলাকার গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় বৃক্ষ প্রজাতির চারা উৎপাদন ও চাষ পদ্ধতির ম্যানুয়েল

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	০২
সূচনা	০৩
কক্সবাজার এলাকার গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় বৃক্ষের পরিচিতিমূলক বিবরণ	
০১. আরশল বা হরিনা	০৬
০২. কনক বা বোনাক	০৮
০৩. তেলিয়া গর্জন বা কালি গর্জন	১০
০৪. গুটগুইট্টা বা নিউর	১২
০৫. চাম্পা বা স্বর্ণ চাম্পা বা চাম্পাফুল	১৪
০৬. চিকরাশি	১৬
০৭. ঢাকি জাম	১৮
০৮. তেজবহল বা তেজমাটান	২০
০৯. তেলসুর বা তেরসল	২২
১০. তুন বা সুরুজবেদ	২৪
১১. ধারমারা	২৬
১২. নারিকেলি বা বুদ্ধু নারিকেল	২৮
১৩. বান্দরহোলা	৩০
১৪. বৈলাম	৩২
১৫. সিভিট বা আম চুন্ডুল	৩৪
গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় বৃক্ষ প্রজাতির চাষ পদ্ধতি	৩৬

মুখবন্ধ

আরণ্যক ফাউন্ডেশন ২০০৯ সাল থেকে বন বিভাগের সাথে যৌথ উদ্যোগে কক্সবাজারের রক্ষিত বনাঞ্চল সংরক্ষণের জন্য বন সংলগ্ন বন-নির্ভর দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারসমূহকে চিহ্নিত করে তাদের বিকল্প জীবিকায়নের ব্যবস্থা করে এবং তাদের নিয়ে একটি সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করে। পরবর্তীতে আরণ্যক ফাউন্ডেশন ২০১৪ সাল থেকে বিশ্ব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু সহিষ্ণু বনায়ন ও পুন:বনায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এ কর্মসূচিকে আরও জোরদার করে। ২০০৯ সালে আরণ্যক ফাউন্ডেশন টেকনাফ ও ইনানির বনাঞ্চলের ভিত্তি জরিপ করে। তখনও সেখানে প্রচুর উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈচিত্র্য ছিল। গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় গাছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উরি আম, সিভিট, কুর্চ, গুটগুইট্যা, শিল-বাদি, ধুপ, হরিতকি, বহেরা, হারগোজা, তেলি গর্জন, তেলসুর, বৈলাম, বুড়া, সিন্দুর, কালি বাটনা, ধলি বাটনা, ঝুমকাবাদি, মেন্দা, তেজবহল, চম্পা, চিকরাশি, তুন, সাদা কড়ই, কালা কড়ই, চাকুয়া কড়ই, লোহাকাঠ, ডুমুর, বড় ডুমুর, লাল ডুমুর, জইগ্যা ডুমুর, ঢাকি জাম, নলি জাম, ডাকরুম, হরিনা, উদাল, মুস, আরশল, গামার, বরমালা, গোদা, ইত্যাদি। ২০১৭ সালে আরণ্যক ফাউন্ডেশন ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বন ও পরিবেশ ইনস্টিটিউটের একদল বিজ্ঞানী আলাদাভাবে সেখানকার উদ্ভিদ বৈচিত্র্য জরিপ করে। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও বন নির্ভর দরিদ্র পরিবারসমূহের বিকল্প জীবিকায়নের ফলে মানুষের বনের ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে কমে আসছিল। ফলে বনের বৃক্ষ প্রজাতির সংখ্যা যেমন বেড়েছিল, তেমনি বন্যপ্রাণীর সংখ্যাও বেড়েছিল। কিন্তু ২০১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের উখিয়া ও টেকনাফের ৬,০০০ একর বনাঞ্চলে আশ্রয় দিতে গিয়ে তাদের আবাসস্থল ও তার আশপাশের বনাঞ্চলের প্রচুর ক্ষতি সাধন হয়েছে। এসব বনে জরুরি ভিত্তিতে বনায়ন প্রয়োজন।

আমরা জানি আকাশমনি ও ইউক্যালিপটাস দ্রুত বাড়ে ও বন্যপ্রাণী এসব গাছকে নষ্ট করে না। কিন্তু পরিবেশ ও প্রতিবেশের কথা বিবেচনা করে আমরা কক্সবাজারের বনাঞ্চলে দেশীয় গাছ লাগানোর জন্য সকলকে উৎসাহিত করছি।

আরণ্যক ফাউন্ডেশন ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর যৌথ উদ্যোগে কক্সবাজার জেলার সকল নার্সারি মালিকদের নিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ের নার্সারি মালিক সমিতি সৃষ্টি করে তাদেরকে দেশীয় প্রজাতির গুণগত মানের চারা উত্তোলন পদ্ধতির ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এলাকার চাহিদা মোতাবেক নার্সারি মালিকগণ কক্সবাজার জেলার জন্য উপযোগী দেশীয় উন্নত মানের চারা উত্তোলন করে যাচ্ছে। যারা কক্সবাজার এলাকায় বনায়নে সম্পৃক্ত তারা স্থানীয় নার্সারি থেকে গুণগত মানের চারা সংগ্রহ করতে পারবেন। কোন স্থানের জন্য কোন জাতের চারা লাগাবেন এবং ভালো চারা কিভাবে চিনবেন, চারা লাগানোর পর গাছের পরিচর্যা কিভাবে করতে হবে সব বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা ম্যানুয়েলে উল্লেখ আছে।

সূচনা

বাংলাদেশ একটি ঘন বসতিপূর্ণ দেশ। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১১০০ এর বেশি লোক বসবাস করে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক বন ও বন্যপ্রাণী ধীরে ধীরে কমে আসছে। অনেকে বন ভূমির গাছপালা কেটে বা বন থেকে অধিক হারে বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করে আমাদের বনের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। অনেক বনাঞ্চলে এখন বাড়ি ঘর ও কল কারখানা দেখা যায়। বনের জমি ব্যবহার করা হচ্ছে কৃষি ফসল উৎপাদনে। অতীতে আমাদের গ্রামাঞ্চলে বাড়ির আশে পাশে যে ঝোপঝাড় ছিল তাও পরিস্কার করে এখন সেখানে বাড়ি বা খামার করেছে। ফলে গ্রামাঞ্চল ও বনাঞ্চল সব স্থানেই গাছপালা ও বন্যপ্রাণী কমে গেছে। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল অনেক স্থানেই ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে আমাদের জীববৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য বনজ দ্রব্যের চাহিদা পূরণে বিশেষ করে কাঠ ও জ্বালানি কাঠের চাহিদা মেটাতে আমাদের দেশে অনেক স্থানে দ্রুত বর্ধনশীল বিদেশী গাছ লাগানো হয়েছে। বনায়নে মানুষ এসব গাছ লাগিয়েছে। দেশীয় গাছের তুলনায় এসব বিদেশী গাছ থেকে কাঠ বেশি পাওয়া গেলেও পরিবেশ ও প্রতিবেশের জন্য এসব গাছ উপযোগী নয়। এসব গাছ প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বেশ সময় লাগে। দেশীয় গাছসমূহ বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে। কিন্তু তার স্থলে বিদেশী গাছ লাগানো হলে বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল অনেকাংশে নষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের স্থানীয় বন্যপ্রাণীরা অন্যত্র চলে যায়। ফলে ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। দেশীয় গাছ নির্দিষ্ট পরিবেশে টেকসইভাবে জন্মাতে পারে। কিন্তু বিদেশী গাছের জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োজন হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় দেশীয় গাছের তুলনায় বিদেশী গাছগুলো মাটি থেকে বেশি পানি টেনে নেয়। দেশীয় গাছে যে পাখি ও পোকামাকড় থাকে সেগুলো পরাগায়নে সহায়তা করে থাকে। কিন্তু বিদেশী গাছে নতুন ভাবে পাখি ও পোকামাকড় আসতে সময় লাগে বা আদৌও আসে না। কিম্বা যেসব পোকামাকড় বা পাখি আসে তাদের চাহিদার সাথে কৃষি ফসলের চাহিদার মিল নাও থাকতে পারে। তাই কৃষি ফসলের উৎপাদন ব্যহত হতে পারে। নানা দিক বিবেচনা করে বনায়নে আমাদের দেশীয় গাছ লাগানোই সব চাইতে উত্তম। মনে রাখতে হবে, বিদেশী দ্রুত বর্ধনশীল গাছ আমাদের দেশীয় ও স্থানীয় গাছের বিকল্প হতে পারে না। একই ভাবে বিদেশী গাছের বনায়ন প্রাকৃতিক বনের বিকল্প হতে পারে না। প্রতিবেশ বা ইকোসিস্টেম রাতারাতি সৃষ্টি করা যায় না। সব দেশীয় গাছ দেশের সকল স্থানে জন্মায় না। মাটির প্রকারভেদ, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, তাপমাত্রাসহ নানা ভৌতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি ইকোসিস্টেম তৈরি হয়। কাজেই গাছ লাগানোর সময় সব গুণাবলী বিবেচনা করে আমাদের গাছ লাগাতে হবে। যেখানে বন ধ্বংস হয়েছে বা কোন বিশেষ কারণে বনের গাছপালা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে আমরা শুধুমাত্র সেখানেই দেশীয় গাছ লাগাবো।

বাংলাদেশ যত ছোট দেশই হউক না কেন, মাটির প্রকৃতি, বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার নিরিখে বাংলাদেশে ৩০টি কৃষি প্রতিবেশ অঞ্চল রয়েছে। একই ভাবে গাছের বিস্তৃতি বিবেচনা করা হলে আমাদের দেশে ১১টি বৃক্ষ জোন রয়েছে। এর মানে হচ্ছে সব দেশীয় গাছ দেশের সব স্থানে ভালো জন্মায় না। উপকূলীয় বা ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের গাছ পাহাড়ি এলাকায় জন্মাবে না। বসত বাড়িতে যে গাছ জন্মে তা সাধারণত পাহাড়ে জন্মায় না। শাল বনে যে

গাছ জন্মায় তা উপকূলীয় অঞ্চলে জন্মায় না। কোন নির্দিষ্ট প্রতিবেশে বিশেষ কিছু গাছ ভালো জন্মে।

এক সময়ে আমাদের বনাঞ্চল ছিল জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। প্রাকৃতিক বনের নানা ধরনের গাছপালা বাণিজ্যিকভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও পরিবেশ ও প্রতিবেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মানুষের কাঠের চাহিদা মেটাতে এসব প্রাকৃতিক বন কেটে সেখানে বিদেশী গাছের বাণিজ্যিক বনায়ন করা হয়েছে। এতে আমরা হয়তো অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা লাভবান হয়েছি, কিন্তু আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় গাছ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। অনেক দেশীয় গাছ আজ বিলুপ্তপ্রায়। কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনে এক সময়ে সব চেয়ে বেশি লম্বা ও মোটা যে গাছগুলো দেখা যেত তার মধ্যে বৈলাম ও সিভিট উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আজ এসব গাছ কদাচিৎ দেখা যায়। বাঁশপাতা নামক একটি গাছ সারা দেশে আছে মাত্র ১১০টি। তাও বেশির ভাগ গাছ বোটানিক্যাল গার্ডেনে। আমাদের দেশে চার ধরনের গর্জন গাছ ছিল। এখন তেলি গর্জন ছাড়া বাকি তিনটি প্রজাতির গর্জন গাছ দেখা যায় না বললেই চলে। বাটনার রয়েছে অনেক প্রজাতি। কিন্তু বনে ঘুরে দুই তিনটির বেশি বাটনা প্রজাতির গাছ পাওয়া যায় না। গুটগুইট্টা গাছের কাঠ ঘুণে ধরে না। ঠিক এমনি অনেক গাছ রয়েছে যেগুলো আজ বনে খুঁজে পাওয়া কঠিন। যেমন- পিতরাজ, চাপালিশ, চাম্বল, কাইঞ্জালবাদি, মুস, মাইলাম, উরি আম, বরমালা, পুন্যাল, কামদেব, বাটনা, শিল বাটনা, জাত বাটনা, কদু বাটনা, দুরা বাটনা, কান্তা বাটনা, কালা বাটনা, গুইজা বাটনা, ধলি বাটনা, মেন্দা, মহুয়া, নাগেশ্বর, পুতি কদম, টালি, বাঁশপাতা, সিভিট, করঞ্জা, গুটগুইট্টা, কনক চাপা, বুদ্ধ নারিকেল, কুসুম, উদাল, শেওড়া, ঢাকি জাম, চিকরাশি, তেজবহল, বরুনা, ঝুনঝুনা কড়ই, হারগোজা, ধলি গর্জন, শিল গর্জন, তেলি গর্জন, বাইট্যা গর্জন, বান্দরহোলা, ডুমুর, বৈচি, তেলসুর, চালমুগরা, সিদা জারুল ইত্যাদি।

সম্প্রতি মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত প্রায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দিতে গিয়ে সরকার ৬,০০০ একর জমির বনাঞ্চল পরিস্কার করে তাদের জন্য বসতি তৈরি করে দিয়েছে। এতে মানবতার প্রতি সহানুভূতি দেখানো হয়েছে বটে, তবে ৬,০০০ একরে বসবাসরত ১১ লক্ষ রোহিঙ্গার জ্বালানি কাঠের চাহিদা মেটাতে আরো কমপক্ষে ৪,০০০ একর বনের জ্বালানি ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণ করে প্রায় বৃক্ষ শুন্য করে ফেলা হয়েছে। সম্প্রতি রোহিঙ্গাদের জ্বালানি হিসেবে সিএনজি সিলিন্ডার দেয়া হয়েছে। আশা করা যায়, এতে তাদের জ্বালানির চাহিদা পূরণ হয়েছে। তাই এসব বৃক্ষ শুন্য বনকে বনায়ন করে হাতির আবাসস্থলসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ফিরিয়ে দিতে হবে। এসব বনে যে সব দেশীয় গাছপালা ছিল সে সব গাছপালা দ্বারা আমাদের বনায়ন করতে হবে।

রচিত ম্যানুয়েলে কক্সবাজার ও এর আশে পাশের পাহাড়ি অঞ্চলে কি কি দেশীয় গাছ জন্মে এবং এসব গাছ দিয়ে বনায়ন করতে হলে কিভাবে গাছের বীজ সংগ্রহ করতে হয় ও চারা তুলতে হয় এবং চারা কিভাবে লাগাতে হবে ও পরিচর্যা করতে হবে ইত্যাদির বর্ণনা এ প্রকাশনায় রয়েছে। আশা করি এ প্রকাশনাটি কক্সবাজার এলাকায় যারা বনায়নে সম্পৃক্ত তাদের সকলের উপকারে আসবে।

কক্সবাজার এলাকার গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় গাছের স্থানীয় নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম নিম্নে প্রদান করা হলো।

ক্রঃ নং	স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
০১	আরশল/হরিনা/গোদা	*Vitex glabrata*
০২	কনক/বোনাক	*Schima wallichii*
০৩	তেলিয়া গর্জন/কালি গর্জন	*Dipterocarpus turbinatus*
০৪	গুটগুইট্টা/নিউর/লোহাভাদি	*Protium serratum*
০৫	চাম্পা/স্বর্ণ চাম্পা/চাম্পাফুল	*Michelia champaca*
০৬	চিকরাশি/পবা	*Chukrasia tabularis*
০৭	ঢাকি জাম/পনিয়া জাম	*Syzygium firmum*
০৮	তেজবহল/তেজমাটান/কস্তুরী	*Cinnamomum iners*
০৯	তেলসুর/তেরসল	*Hopea odorata*
১০	তুন/সুরুজবেদ/রর্থগি	*Toona ciliata*
১১	ধারমারা/আতকোপালি	*Stereospermum colais*
১২	নারিকেলি/বুদ্ধু নারিকেল	*Pterygota alata*
১৩	বান্দরহোলা/রামদালু	*Duabunga grandiflora*
১৪	বৈলাম/বইলশরা/সাদা বৈলাম	*Anisoptera scaphula*
১৫	সিভিট/আম চুন্ডুল	*Swintonia floribunda*

কক্সবাজার এলাকার উপযোগী স্থানীয় গাছের বীজ সংগ্রহকাল, সংরক্ষণকাল, চারা গজানোর সময় ও অংকুরোদ্দম হার নিম্নে প্রদান করা হলো।

ক্রঃনং	স্থানীয় নাম	বীজ সংগ্রহকাল	কেজি প্রতি বীজের সংখ্যা	বীজ সংরক্ষণকাল	চারা গজানোর সময় (দিন)	চারা গজানোর হার (%)
০১	আরশল	মে-জুলাই	৪০০-৫০০	১-২ মাস	১৫-২০	৫৫-৬০
০২	কনক	এপ্রিল-জুন	১.৬-৩.৫ লক্ষ	৩-৫ মাস	১০-১৫	৪০-৫০
০৩	তেলিয়া গর্জন	মে-জুন	১৫০-১৭০	৭-১০ দিন	১০-১২	৭০-৮০
০৪	গুটগুইট্টা	জুলাই-আগস্ট	১২০০-১৫০০	১৫-২০ দিন	২০-২৫	৩০-৪০
০৫	চাম্পা	আগস্ট-সেপ্টে	১০-১২ হাজার	১০-১৫ দিন	৭-১০	৬০-৭০
০৬	চিকরাশি	জানু-ফ্রেব্রু	৪৫-৫০ হাজার	১-২ মাস	১০-১৫	৫০-৫৫
০৭	ঢাকি জাম	জুন-জুলাই	১১০-১১৫	১-২ মাস	২০-২৫	৭০-৮০
০৮	তেজবহল	মার্চ-এপ্রিল	৬২০০-৬৪০০	১-৬ মাস	২০-২৫	৫০-৬০
০৯	তেলসুর	মে-জুন	১৮০০-২০০০	৭-১০ দিন	৪-৫	৭০-৮০
১০	তুন	মার্চ-এপ্রিল	১.৪-১.৫ লক্ষ	১ মাস	৭-১০	৫০-৬০
১১	ধারমারা	ফেব্রু-মার্চ	৭৫-৮০ হাজার	৫-৬ মাস	৭-১০	৬০-৭০
১২	নারিকেলি	এপ্রিল-জুন	৭০০-৮০০	১৫-২০ দিন	৮-১০	৫০-৬০
১৩	বান্দরহোলা	এপ্রিল-মে	প্রায় ২৪ লক্ষ	১ বছর	৩০-৩৫	২৫-৩০
১৪	বৈলাম	মে-জুন	১০০-১৫০	৭-১০ দিন	৫-৭	৭০-৮০
১৫	সিভিট	এপ্রিল-মে	৭৫০-৮০০	৭-১০ দিন	৫-৭	৭০-৮০

কক্সবাজার এলাকার গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় বৃক্ষের পরিচিতিমূলক বিবরণ

০১ আরশল বা হরিনা

পরিচিতি: আরশল (*Vitex glabrata*) অঞ্চলভেদে হরিনা, গোদা (চট্টগ্রাম), আশাল, বাট্রি, বানসকুরা বা বাসকুরা (ময়মনসিংহ) ইত্যাদি নামে পরিচিত। বাংলাদেশে আরশল একটি বিপন্ন দেশীয় প্রজাতির গাছ।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটের পাহাড়ি বনাঞ্চলে এবং ময়মনসিংহের শাল বনে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো আরশল গাছ দেখা যায়। ঢাকার মিরপুরের জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে লাগানো আরশলের কিছু গাছ রয়েছে।

গাছের বিবরণ: আরশল বড় আকৃতির পাতাঝরা বৃক্ষ, উচ্চতায় ২৫-৩০ মিটার ও গাছের বেড় প্রায় ১.২৫ মিটার। গাছের গোড়ার অংশে ঠেশমূল রয়েছে। গুঁড়ি বা প্রধান কান্ড সোজা, নলাকার, ১৫ মিটার পর্যন্ত ডালপালা বিহীন এবং কান্ডের চারিদিকে লম্বালম্বি একাধিক গভীর খাঁজ ও ভাঁজ দেখা যায়। কচি ডালপালা চারকোণা বিশিষ্ট। লম্বা বোটার আগায় ডিম্বাকৃতির ৩-৫টি পত্রক দ্বারা সজ্জিত। মার্চ-এপ্রিল মাসে সুঘ্রাণযুক্ত সাদা ও নীল, লালচে বা হলুদ বর্ণে মিশ্রিত ফুল ফোটে। ফল ডিম্বাকার, রসালো ধরনের এবং প্রসারিত বৃতিযুক্ত। মে-জুলাই মাসে পরিপক্ক ফল কালো বর্ণ ধারণ করে। প্রতি ফল একক বীজ বিশিষ্ট। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ৪০০-৫০০টি। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বায়ুরোধক পাত্রে বীজ ১-২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: আরশল কাঠ হলদে বাদামি বর্ণের, শক্ত, ভারী ও মজবুত এবং সুন্দর পালিশ হয়। ঘরবাড়ি নির্মাণ, আসবাবপত্র, কৃষি সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতির হাতল তৈরিতে এ কাঠ ব্যবহৃত হয়। শিকড় ও বাকল ভেষজ গুণ সম্পন্ন। ফল ভক্ষণীয়। অনেক দেশে চা বাগানে ছায়া গাছ হিসেবে আরশল লাগানো হয়।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার: সাধারণত বন এলাকায় বীজ থেকে জন্মানো চারা দিয়ে আরশলের বংশ বিস্তার হয়।

নার্সারিতে চারা উৎপাদন: নার্সারিতে আরশলের সংগৃহীত বীজ পলিব্যাগে বা নার্সারি বেডে বপন করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম বা চারা গজানোর হার শতকরা ৫৫-৬০ ভাগ। চারা গজাতে সময় লাগে ১৫-২০ দিন।

ছবি-১(ক): পাতাসহ আরশলের ডালপালা (বামে) এবং ফুলসহ আরশল গাছ (ডানে)

ছবি-১(খ): আরশল ফুল (বামে) এবং ফল (ডানে)

০২ কনক বা বোনাক

পরিচিতি: কনক (*Schima wallichii*) অঞ্চলভেদে মুন-চাম্পা (পার্বত্য চট্টগ্রাম), কনক (চট্টগ্রাম), বোনাক (সিলেট), পুইন্যা-বং (মগ) ইত্যাদি নামে পরিচিত।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ি বনাঞ্চলে ও ময়মনসিংহের শাল বনে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো কনক গাছের বিক্ষিপ্ত বিস্তৃতি রয়েছে।

গাছের বিবরণ: কনক মধ্যম থেকে বড় আকৃতির চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ২০-২৫ মিটার এবং গাছের বেড় ১.২৫-২.৫০ মিটার পর্যন্ত হয়। গাছের গোড়াতে ১.৮ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ঠেশমূল রয়েছে। গুঁড়ি বা প্রধান কান্ড সোজা, নলাকার এবং প্রায় ১৫ মিটার পর্যন্ত ডালপালা বিহীন। বাকল বেশ পুরু, গাঢ় ধূসর থেকে কালো বর্ণের এবং বহিরাবরণ লম্বালম্বিভাবে গভীর ফাটল ও খাঁজযুক্ত। পাতা উপবৃত্তাকার, কিনারা মসৃণ এবং আগা সূচালো। মার্চ-এপ্রিল মাসে সুগন্ধিযুক্ত একক সাদা বর্ণের ফুল ফোটে। ফল ৫ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ক্যাপসুল আকৃতির এবং কাষ্ঠল। এপ্রিল-জুন মাসে ফল পরিপক্ক হয়। ফলের প্রতি প্রকোষ্ঠে ২-৬টি করে বীজ থাকে এবং বীজগুলো ছোট হালকা পাখনাযুক্ত। পরিপক্ক ফল আপনা-আপনিভাবে ফেটে বাতাসের সাহায্যে বীজ ছড়িয়ে পড়ে। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১,৬০,০০০-৩,৫০,০০০টি। বীজের আয়ুষ্কাল কম, তবে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বায়ুরোধক পাত্রে ৩-৫ মাস পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: কনকের অসার কাঠ গাঢ় হালকা ধূসর এবং সার কাঠ হালকা বাদামি বা ধূসর-বাদামি থেকে লাল-বাদামি বর্ণের, মধ্যম থেকে ভারী, শক্ত, মজবুত এবং মধ্যম টেকসই। জ্বালানি হিসেবে এবং গৃহ নির্মাণে খুঁটি, বীম, দরজা-জানালার ফ্রেম, উন্নত মানের প্লাইউড, জলযান ও বাস-ট্রাকের বডি, কৃষি সরঞ্জামাদি, কাগজের মন্ড ইত্যাদি তৈরিতে কাঠ ব্যবহৃত হয়। পার্বত্য এলাকায় কাঠের ব্রিজ এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক গাছ দিয়ে পানিতে ভাসমান ভেলা তৈরি করা হয়। ভারতে কফি বাগানের ছায়া গাছ হিসেবে লাগানো হয়। বাকলের ট্যানিন চামড়া প্রক্রিয়াকরণে ও রঙ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। গাছের বিভিন্ন অংশে ভেষজ গুণাগুণ রয়েছে যা মেয়েদের জরায়ুর জটিলতা, হিস্টেরিয়া ও গুঁটি বসন্ত নিরাময় করে।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার: বন এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে বীজ থেকে কনকের চারা ও গাছ জন্মায়। কনক গাছে ভালো কপিচিং হয় অর্থাৎ কর্তনকৃত গাছের গোড়া বা মোথা থেকে কুশি বা চারা জন্মায় এবং পর্যায়ক্রমে বড় গাছে পরিণত হয়।

নার্সারিতে চারা উৎপাদন: কনক বীজের আয়ুষ্কাল কম বিধায় এপ্রিল-জুন মাসে সংগৃহীত বীজ সাথে সাথে ট্রেতে বা সীড বেডে বপন করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম বা চারা গজানোর হার শতকরা ৪০-৫০ ভাগ। চারা গজাতে সময় লাগে ১০-১৫ দিন।

ছবি-২ (ক): কনক গাছ (বামে) এবং পাতাসহ ফুল (ডানে)

ছবি-২(খ): কনক গাছের পরিপক্ক ফল (বামে) এবং বীজ (ডানে)

০৩ তেলিয়া গর্জন বা কালি গর্জন

পরিচিতি: তেলিয়া গর্জন (*Dipterocarpus turbinatus)* অঞ্চলভেদে তেলি গর্জন বা কালি গর্জন (চট্টগ্রাম) এবং কুরইল নামেও পরিচিত।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলের চিরসবুজ ও মিশ্র চিরসবুজ বনে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মানো তেলিয়া গর্জন গাছ দেখা যায়। এ ছাড়া চট্টগ্রাম শহর এলাকার রেল ভবন ও পাহাড়তলীর কৈবল্যধাম নামক স্থানে বড় আকৃতির বয়স্ক কিছু তেলিয়া গর্জন গাছ রয়েছে।

গাছের বিবরণ: তেলিয়া গর্জন বড় আকৃতির চিরসবুজ বৃক্ষ,উচ্চতায় ৩০-৪০ মিটার এবং গাছের বেড় ১২০-১৬০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। প্রধান কান্ড সোজা, নলাকার এবং প্রায় ২০ মিটার পর্যন্ত শাখা-প্রশাখা বিহীন। গাছের মাথায় শাখা-প্রশাখার বিস্তৃতি দেখতে ছাতার মতো মুকুট আকৃতির। বাকল মসৃণ ও সাদাটে-ধূসর বর্ণের। পাতা আয়তাকার, কিনারা ঢেউ খেলানো এবং আগা সূচালো। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সাদাটে বা গোলাপি বর্ণের ফুল ফোটে। ফল ডিম্বাকার এবং শেষ প্রান্তে পাতা সদৃশ পাতলা দুটি পাখনা সংযুক্ত। মে-জুন মাসে পাকা ফল ধূসর বর্ণের হয় এবং বৃন্তচ্যুত হয়ে ফলের পাখনায় বাতাস লেগে ঘুরতে ঘুরতে বহুদূর ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে। প্রতিটি ফল একক বীজ বিশিষ্ট। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১৫০-১৭০টি। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বীজ ৭-১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: তেলিয়া গর্জন কাঠ বেশ শক্ত, মজবুত, টেকসই এবং হালকা খয়েরি বর্ণের। গৃহ নির্মাণে খুঁটি, দরজা-জানালার ফ্রেম, আসবাবপত্র, বাস-ট্রাকের পাটাতন, ঘরের সিলিং ও পানেলিং, জলযান, রেল স্লিপার ও ব্রিজ তৈরিতে কাঠ ব্যবহার করা হয়। গাছের বাকল থেকে সংগৃহীত অলিওরেসিন নামক তেল আদিবাসীরা আলো জ্বালাতে এবং বার্নিশ কাজে ব্যবহার করে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির চিকিৎসায় কম বয়সী গাছের বাকল বাত রোগ ও যকৃত রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার: সাধারণত বীজ থেকে উৎপন্ন চারার মাধ্যমে বংশ বিস্তার হয়।

নার্সারিতে চারা উৎপাদন: তেলিয়া গর্জন গাছের বীজের আয়ুষ্কাল খুবই কম বিধায় সংগৃহীত বীজ দ্রুত সময়ের মধ্যে বপন করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম বা চারা গজানোর হার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ। চারা গজাতে সময় লাগে ১০-১২ দিন।

ছবি-৩ (ক): তেলিয়া গর্জন গাছ (বামে) এবং ফুল (ডানে)

ছবি-৩ (খ): তেলিয়া গর্জনের অপরিপক্ক ফল (বামে) এবং পাখনাযুক্ত পরিপক্ক ফল (ডানে)

০৪ গুটগুইট্টা বা নিউর

পরিচিতি: গুটগুইট্টা (*Protium serratum*) অঞ্চলভেদে লুও-বাদি (চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম), হিলিয়াভাদি, নিউর বা নিহর (ঢাকা-ময়মনসিংহ), লোহাভাদি, হাজনা, হেরু (সিলেট), থিক্রিং (মগ), সুইদিসি (মারমা) ইত্যাদি নামে পরিচিত।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটের পাহাড়ি বনাঞ্চলে এবং গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল মধুপুরের পাতাঝরা শাল বনে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো গুটগুইট্টার কিছু গাছ দেখা যায়।

গাছের বিবরণ: গুটগুইট্টা বড় আকৃতির চিরসবুজ বা আংশিক পাতাঝরা বৃক্ষ, উচ্চতায় ৩০-৪০ মিটার এবং গাছের বেড় ২ মিটার পর্যন্ত হয়। গুঁড়ি বা প্রধান কান্ড খাটো, সোজা এবং নলাকার। বাকল পুরু, বাদামি বা হালকা ধূসর বর্ণের এবং বাকলের উপরিভাগ ফাটলযুক্ত ও বাকলের স্তর খসে পড়ে। পাতার পত্রক সংখ্যা ৫-১১টি, কিনারা মসৃণ এবং আগা সূচালো। শীতকালে পাতা ঝরার আগে পাতাগুলো কমলা বা লাল বর্ণ ধারণ করে। মার্চ-এপ্রিল মাসে লম্বা পুষ্পবিন্যাসে ছোট আকারের সবুজাভ বর্ণের ফুল ফোটে। ফল উপবৃত্তাকার, ২-৩টি খাঁজযুক্ত। জুলাই-আগস্ট মাসে পরিপক্ক ফল লাল বর্ণের হয়। প্রতিটি ফলে ১-৩টি করে বীজ থাকে। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১,২০০-১,৫০০টি। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বীজ ১৫-২০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: গুটগুইট্টার অসার কাঠ হালকা বাদামি এবং সার কাঠ লালচে-বাদামি বর্ণের, ভারী, শক্ত, মজবুত এবং টেকসই। ঘরের খুঁটি ও আসবাবপত্র নির্মাণে এবং রেলের স্লিপার তৈরিতে কাঠ ব্যবহার করা হয়। ফল ভক্ষণযোগ্য এবং তরকারি হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায়। মুখের আলচার চিকিৎসায় ফল ব্যবহৃত হয়।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার: বন এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে গুটগুইট্টার বীজ থেকে চারা ও গাছ জন্মায়।

নার্সারিতে চারা উৎপাদন: নার্সারিতে জুলাই-আগস্ট মাসে সংগৃহীত বীজ সাথে সাথে ট্রেতে বা পলিব্যাগে বপন করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম বা চারা গজানোর হার শতকরা ৩০-৪০ ভাগ। চারা গজাতে সময় লাগে ২০-২৫ দিন।

ছবি ৪-(ক): গুটগুইট্টা গাছ (বামে) এবং ফুল (উপরে) ও অপরিপক্ক ফল (নিচে)

ছবি ৪-(খ): গুটগুইট্টার পাকা ফল (বামে) এবং নার্সারিতে উত্তোলিত চারা (ডানে)

০৫ চাম্পা বা স্বর্ণ চাম্পা বা চাম্পাফুল

পরিচিতি: চাম্পা (*Michelia champaca*) অঞ্চলভেদে চাঁপা, স্বর্ণ চাম্পা বা স্বর্ণ চাঁপা, চাম্পা-সুন্দি (সিলেট), চাম্পাফুল (পার্বত্য চট্টগ্রাম), ছেঙ্গ (মগ), বল স্নাবাত (গারো) ইত্যাদি নামে পরিচিত।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও শ্রীমঙ্গলের লাউয়াছড়া পাহাড়ি বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো কতিপয় চাম্পা গাছ দেখা যায়। শোভাবর্ধনকারী গাছ হিসেবে সারা দেশব্যাপী রাস্তার পাশে, অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিনোদনমূলক পার্ক এবং ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে লাগানো চাম্পার কিছু গাছ রয়েছে।

গাছের বিবরণ: চাম্পা বড় আকৃতির চিরসবুজ বা আংশিক পাতাঝরা বৃক্ষ, উচ্চতায় ৩০-৪০ মিটার এবং গাছের বেড় ২.৫-৩.৫ মিটার পর্যন্ত হয়। গুঁড়ি বা প্রধান কান্ড সোজা, নলাকার এবং বাকল পুরু, মসৃণ ও হালকা ধূসর বর্ণের। পাতা আয়তাকার, কিনারা মসৃণ এবং আগা সূচালো। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পাতার কক্ষে একক হালকা হলুদ বা সোনালি বর্ণের মিষ্টি সুগন্ধি ফুল ফোটে। গাছে থোকায় থোকায় গুচ্ছবদ্ধ গোলাকৃতির ফল ধরে। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পরিপক্ক ফল বাদামি বর্ণের হয়। প্রতি ফলে ৫-৬টি করে কালো বর্ণের বীজ থাকে এবং বীজগুলো গোলাপি বা লালচে আবরণে আবৃত। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১০,০০০-১২,০০০টি। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বীজ ১০-১৫ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: হিন্দু ও বৌদ্ধদের নিকট চাম্পা গাছ অত্যন্ত পবিত্র। কাঠ হলদে-বাদামি বর্ণের, শক্ত, মজবুত এবং টেকসই। শ্রীলংকায় বুদ্ধমূর্তি তৈরিতে এ মূল্যবান কাঠ প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এ কাঠ দিয়ে সৌখিন আসবাবপত্র, দরজা-জানালার পাল্লা ও কেবিনেট তৈরি করা হয়। ফুলকে শোভাবর্ধকরূপে কাঁচের বোতলে সংরক্ষণ পূর্বক অনেক দিন রাখা যায়।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার: বন এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে চাম্পার বীজ থেকে চারা ও গাছ জন্মায়।

নার্সারিতে চারা উৎপাদন: নার্সারিতে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সংগৃহীত পরিপক্ক ফল ছায়াযুক্ত স্থানে স্তূপাকার করে রাখলে ৪-৫ দিনের মধ্যে ফলগুলো ফাটতে শুরু করে। এ অবস্থায় বীজের গোলাপি আবরণ সরিয়ে কালো বীজগুলো ছায়াতে একদিন রেখে শুকাতে হবে। বীজ রোদে শুকানো যাবে না। বীজের আয়ুস্কাল কম। তাই সাথে সাথে বীজ পলিব্যাগে বপন করতে হয়। বীজ বপনের ১০-১২ দিনের মধ্যে চারা গজানোর শুরু হয় এবং ৪-৫ সপ্তাহের মধ্যে চারা গজানো সম্পন্ন হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম বা চারা গজানোর হার শতকরা ৬০-৭০ ভাগ।

ছবি-৫ (ক): চাম্পা গাছ (বামে) এবং ফুল (উপরে) ও গুচ্ছবদ্ধ ফল (নিচে)

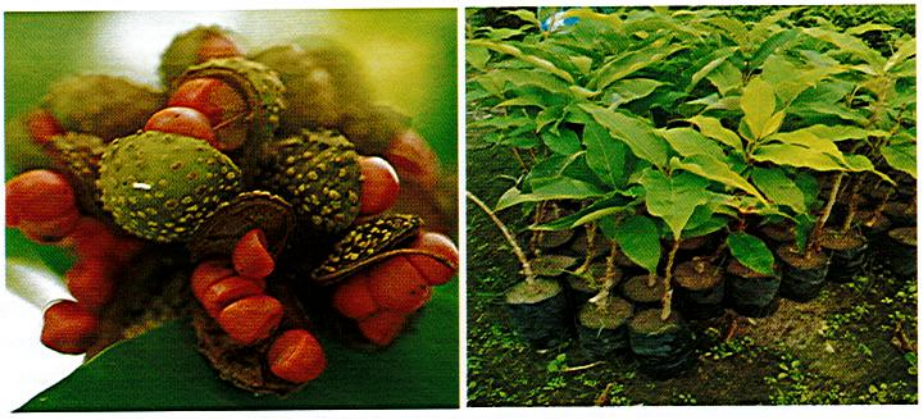

ছবি-৫(খ): চাম্পার ফল ফেটে বের হওয়া গোলাপি বর্ণে আবৃত বীজ (বামে) এবং চারা (ডানে)

০৬ চিকরাশি

পরিচিতিঃ চিকরাশি (*Chukrasia tabularis*) অঞ্চলভেদে ডালমারা, পব্বা, হাইথনা-পমা (সিলেট), চাবারাশি (চাকমা), সিবারাশি বা সাইপ্রবাং (মগ), বল-ডরেক বা চুমা (গারো) ইত্যাদি নামে পরিচিত।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থানঃ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলের চিরসবুজ ও মিশ্র চিরসবুজ বনে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মানো চিকরাশির কতিপয় গাছ দেখা যায়। কিছু এলাকায় বন বিভাগের লাগানো চিকরাশির বাগান রয়েছে। ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন প্রকল্প এবং জলবায়ু সহিষ্ণু অংশগ্রহণমূলক বনায়ন প্রকল্পের অধীনে ২০১১ সন থেকে ২০১৬ সন অবধি চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলায় অসংখ্য চিকরাশির চারা রোপণ করা হয়েছে।

গাছের বিবরণঃ চিকরাশি বড় আকৃতির পাতাঝরা বৃক্ষ, উচ্চতায় ২০-২৫ মিটার এবং গাছের বেড় ২.৫ মিটার পর্যন্ত হয়। গুঁড়ি বা প্রধান কান্ড সোজা,নলাকার এবং বাকল পুরু, মরিচা-বাদামি বর্ণের এবং বহিরাবরণ ফাটলযুক্ত। পাতার পত্রক সংখ্যা ১০-২৪টি, পত্রকগুলোর কিনারা ঢেউ খেলানো ও আগা সূচালো। নতুন গজানো পাতাগুলো লালচে বর্ণের। মে-জুন মাসে সাদা বর্ণের ছোট আকারের ফুল ফোটে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ফল পরিপক্ক হয়। পরিপক্ক ফল গোলাকার,কাষ্ঠল ও বাদামি বর্ণের। প্রতিটি ফলের ভেতর তিনটি প্রকোষ্ঠে পাখনাযুক্ত ১০০-১৫০টি বীজ থাকে। পাকা ফল আপনা-আপনি ফেটে গিয়ে পাখনাযুক্ত বীজগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ৪৫,০০০-৫০,০০০টি। বীজের আয়ুষ্কাল বা সংরক্ষণকাল ১-২ মাস।

গুরুত্ব ও ব্যবহারঃ চিকরাশির কাঠ হালকা খয়েরি বর্ণের, বেশ শক্ত, মজবুত এবং টেকসই। আসবাবপত্র, খোদাই করার কাজে, রেলগাড়ির কামরা নির্মাণে ও প্লাইউড তৈরিতে কাঠ ব্যবহার করা হয়। গাছের শিকড়, বাকল, বীজ ও কাঠে রয়েছে একাধিক অ্যালকালয়েড ও জৈব এসিড। গাছের রস থেকে হলুদ বর্ণের আঠা পাওয়া যায়। কচি পাতা গ্যাস্ট্রিক এবং বাকল ডায়রিয়া নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়।

প্রজনন ও বংশ বিস্তারঃ সাধারণত বন এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে চিকরাশির বীজ থেকে চারা জন্মায় এবং বংশ বিস্তার হয়। তবে বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে চারা গজানোর হার খুবই কম বিধায় তেমন একটা চিকরাশি গাছ জন্মাতে

নার্সারিতে চারা উৎপাদনঃ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সংগৃহীত চিকরাশির পরিপক্ক ফল ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ফল থেকে বীজ আলাদা করা হয়। বীজ সংগ্রহের পর নার্সারিতে ৩ সপ্তাহের মধ্যে ট্রেতে বা পলিথিন ব্যাগে বীজ বপন করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম বা চারা গজানোর হার শতকরা ৫০-৫৫ ভাগ। চারা গজাতে সময় লাগে ১০-১৫ দিন। ট্রেতে গজানো চারা ৪-৫ সেন্টিমিটার লম্বা হলে পলিব্যাগে স্থানান্তর করা যায়।

ছবি-৬(ক): চিকরাশির গাছ (বামে), ফুল (উপরে) এবং অপরিপক্ক ফল (নিচে)

ছবি-৬(খ): চিকরাশির পাকা ফল ও বীজ (বামে) এবং নার্সারিতে উত্তেলিত চারা (ডানে)

০৭ ঢাকি জাম

পরিচিতি: ঢাকি জাম (*Syzygium firmum*) অঞ্চলভেদে ভাট্টি জাম, তিতি জাম, পানিয়া জাম (মগ) ইত্যাদি নামে পরিচিত।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটের মিশ্র চিরসবুজ বনে প্রাকৃতিকভাবে ঢাকি জাম জন্মাতে দেখা যায়। বন বিভাগ দেশের বিভিন্ন বন এলাকাসহ চট্টগ্রামের হাটহাজারী রেঞ্জের সর্তা, মন্দাকিনী ও হাটহাজারী ফরেষ্ট বিটে বেশ কিছু ঢাকি জামের বাগান সৃজন করা হয়েছে।

গাছের বিবরণ: ঢাকি জাম মাঝারি থেকে বড় আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ,উচ্চতায় ২০-৩৫ মিটার এবং গাছের বেড় ২.৫-৩.০ মিটার পর্যন্ত হয়। গুঁড়ি বা প্রধান কান্ড সোজা, নলাকার এবং বাকল পুরু, ধূসর-বাদামি বর্ণের। পাতা আয়তাকার, কিনারা মসৃণ এবং আগা ভোঁতালো। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে থোকায় থোকায় ঘ্রাণ বিশিষ্ট ছোট সাদা বর্ণের ফুল ফোটে। ফল ছোট পেয়ারাকৃতি, থোকায় থোকায় ধরে। জুন-জুলাই মাসে পরিপক্ক ফলগুলো লাল-নীল মিশ্রিত ছাই বা বাদামি বর্ণের। প্রতিটি ফল একক বীজ বিশিষ্ট। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১১০-১১৫টি। বীজের আয়ুষ্কাল বা সংরক্ষণকাল ১-২ মাস।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: ঢাকি জাম কাঠ লালচে-ধূসর বর্ণের, ভারী ও মধ্যম শক্ত। কাঠ গৃহ নির্মাণে খুঁটি, দরজা-জানালার ফ্রেম, রুয়া, পাইড়, ফ্লোর প্যানেল, প্লাইউড ও সেতু তৈরিতে এবং ডালপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাকা ফল পাখি, বাদুর, বানর ও কাঠবিড়ালিরা খেয়ে থাকে।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার: সাধারণত বন এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে বীজ থেকে চারার মাধ্যমে ঢাকি জামের বংশ বিস্তার হয়। পাখি, বাদুর ও বানরেরা পরিপক্ক ফল খেয়ে বন এলাকায় বীজ বিস্তারে সহায়তা করে থাকে। এ গাছ কপিচিং ক্ষমতা সম্পন্ন অর্থাৎ কর্তনকৃত গাছের গোড়া বা মোথা থেকে প্রাকৃতিকভাবে একাধিক কুশি বা চারা জন্মায় এবং পর্যায়ক্রমে বড় গাছে পরিণত হয়।

নার্সারিতে চারা উৎপাদন: জুন-জুলাই মাসে ঢাকি জামের সংগৃহীত পরিপক্ক ফল চটের বস্তায় বা স্তুপাকারে ৮-৯ দিন জাগ দিয়ে রাখলে ফল পচে বীজ বের হয়। নার্সারিতে বীজ ১৫-২০ দিনের মধ্যে পলিব্যাগে বপন করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম বা চারা গজানোর হার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ। চারা গজাতে সময় লাগে ২০-২৫ দিন।

ছবি-৭(ক): ঢাকি জাম গাছ (বামে) এবং গুঁড়ি কান্ড (ডানে)

ছবি-৭(খ): ঢাকি জামের ফুল

ছবি-৭(গ): ঢাকি জামের অপরিপক্ক ফল (বামে) এবং পরিপক্ক ফল (ডানে)

০৮ তেজবহল বা তেজমাটান

পরিচিতি: তেজবহল (*Cinnamomum iners*) অঞ্চলভেদে কস্তুরী, তেজমাটন (চট্টগ্রাম), কারুয়েদ ইত্যাদি নামে পরিচিত। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনে তেজবহল একটি রক্ষিত উদ্ভিদ হিসেবে অভিহিত। বন উজাড়, অতিরিক্ত আহরণ ও আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে তেজবহল গাছের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটের মিশ্র চিরসবুজ বনে এবং ময়মনসিংহের পাতাঝরা শাল বনে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মানো তেজবহলের গাছ কদাচিৎ দেখা যায়।

গাছের বিবরণ: তেজবহল মধ্যম আকৃতির দ্রুত বর্ধনশীল চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ২০-৩০ মিটার এবং গাছের বেড় ৬০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। গুঁড়ি বা প্রধান কান্ড সোজা নলাকার এবং বাকল মসৃণ ও ধূসর বর্ণের। পাতা ডিম্বাকার,কিনারা মসৃণ ও আগা সূচালো। তরুণ পাতা আকারে বেশ বড় এবং কচি পাতা লালচে বর্ণের। বয়স্ক পাতাগুলো দেখতে অনেকটা তেজপাতা বা দারুচিনি পাতার মতো, তবে পাতায় কোনো ধরনের ঘ্রাণ নেই। ফেব্রুয়ারি মাসে ডালপালার আগায় লম্বা শাখান্বিত পুষ্পবিন্যাসে ছোট ক্রিম সাদা বর্ণের ফুল ফোটে। ফল গোলাকার, ৬টি খন্ডিত কাপ আকৃতির স্থায়ী পুষ্পপুট দ্বারা আবৃত। মার্চ-এপ্রিল মাসে পরিপক্ক ফল নীলচে-কালো বর্ণের হয়। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ৬,২০০-৬,৪০০টি। বীজের আয়ুষ্কাল বা সংরক্ষণকাল ১-৬ মাস।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: তেজবহল কাঠ হলুদাভ-বাদামি বর্ণের, মধ্যম শক্ত, মসৃণ, সুগন্ধিযুক্ত এবং পতঙ্গ প্রতিরোধী। গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র ও কেবিনেট তৈরিতে কাঠ ব্যবহার করা হয়। পাতা থেকে সংগৃহীত তেল মিষ্টান্ন ও কনফেকশনারীতে খাদ্য দ্রব্য সুগন্ধিকরণে ব্যবহৃত হয়। অনেক ক্ষেত্রে চা বানানোর সময় তেজবহলের বাকল ও পাতা ব্যবহার করা হয়। বিকল্প ও নিম্ন মানের দারুচিনি হিসেবে তেজবহলের বাকল ব্যবহৃত হয়। সনাতন পদ্ধতিতে ডায়রিয়া, আমাশয়, কাশি ও বাতের ব্যাথা নিরাময়ে তেজবহলের পাতা ব্যবহৃত হয়।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার: সাধারণত বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে বীজ থেকে তেজবহল চারা জন্মায় ও বংশ বিস্তার হয়।

নার্সারিতে চারা উৎপাদন: নার্সারিতে মার্চ-এপ্রিল মাসে তেজবহলের সংগৃহীত পরিপক্ক ফল স্তুপাকারে ৩-৫ দিন জাগ দিয়ে রাখলে ফল পচে বীজ বের হয়। বীজের আয়ুষ্কাল খুবই কম বিধায় সংগৃহীত বীজ দ্রুত সময়ের মধ্যে নার্সারিতে পলিব্যাগে বপন করতে হয়। বীজ বপনের পূর্বে হালকা গরম পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে নিতে হবে। বীজের অঙ্কুরোদগম বা চারা গজানোর হার শতকরা ৫০-৬০ ভাগ। চারা গজাতে সময় লাগে ২০-২৫ দিন।

ছবি-৮(ক): তেজবহল গাছ (বামে) এবং লালচে নতুন পাতা (ডানে)

ছবি-৮(খ): তেজবহল গাছের ফুল

ছবি-৮(গ): তেজবহল গাছের কাঁচা ফল (বামে) এবং নীলচে-কালো পাকা ফল (ডানে)

০৯ তেলসুর বা তেরসল

পরিচিতি: তেলসুর (*Hopea odorata*) অঞ্চলভেদে তেরসল বা তেকসল নামে পরিচিত। বাংলাদেশে তেলসুর একটি দেশীয় বিপন্ন প্রজাতির গাছ।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য এলাকার মিশ্র চিরসবুজ বনে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো তেলসুরের কতিপয় গাছ দেখা যায়। এ ছাড়া টাঙ্গাইলের মধুপুর শাল বনে তেলসুরের সৃজিত বাগান, ঢাকার মিরপুরের জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে এবং ঢাকা শহর এলাকার বেলি রোড ও শেরে-বাংলা নগর আগারগাঁও রোডর পাশে লাগানো বড় আকৃতির কয়েকটি বয়স্ক তেলসুর গাছ রয়েছে।

গাছের বিবরণ: তেলসুর বড় আকৃতির চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ৩০-৩৫ মিটার এবং গাছের বেড় ২.০-২.৫ মিটার পর্যন্ত হয়। গুঁড়ি বা প্রধান কান্ড সোজা নলাকার এবং প্রায় ২০ মিটার পর্যন্ত গুঁড়ি কান্ডে কোন ডালপালা থাকে না। বাকল কালো বাদামি বর্ণের। পাতার আকার গর্জনের তুলনায় ছোট, পাতলা, সবুজ বর্ণ, কিনারা ঢেউ খেলানো ও আগা সূচালো। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ডালপালার আগায় লম্বা পুষ্পবিন্যাসে ছোট আকারের সাদা বর্ণের সুগন্ধি ফুল ফোটে। ফল ডিম্বাকার,পৃষ্ঠভাগ মসৃণ এবং লম্বাটে দুটি পাতলা পাখনা দ্বারা সংযুক্ত। মে-জুন মাসে পরিপক্ক ফল বাদামি বর্ণের হয়। প্রতিটি ফল একক বীজ বিশিষ্ট। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১,৮০০-২,০০০টি। বীজের আয়ুষ্কাল খুবই কম এবং সংরক্ষণকাল ৭-১০ দিন।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: তেলসুর কাঠ বেশ শক্ত, মজবুত ও টেকসই। গৃহ নির্মাণের খুঁটি, দরজা-জানালার ফ্রেম, ছাউনি বা চালার রুয়া, বাটাম ও পাইড়, কাঠের ব্রিজ, লাঙ্গলের ফলা, দেশীয় নৌকা, রেল স্লিপার ইত্যাদি তৈরিতে কাঠ ব্যবহার করা হয়। চামড়া প্রক্রিয়াকরণে বাকলের ট্যানিন ব্যবহৃত হয়। বাকলে ভেষজ গুণাগুণ রয়েছে।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার: সাধারণত বন এলাকায় তেলসুরের পরিপক্ক ফল বৃন্তচ্যুত হলে ফলের পাখনায় বাতাস লেগে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাকৃতিকভাবে বীজ থেকে তেলসুরের চারা ও গাছ জন্মায়।

নার্সারিতে চারা উৎপাদন: তেলসুর বীজের আয়ুষ্কাল খুবই কম বিধায় সংগৃহীত বীজ দ্রুত সময়ের মধ্যে নার্সারিতে পলিব্যাগে বপন করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম বা চারা গজানোর হার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ। চারা গজানো সম্পন্ন হয় ৪-৫ দিনের মধ্যে।

ছবি-৯(ক): তেলসুর গাছ (বামে) এবং ফুল (ডানে)

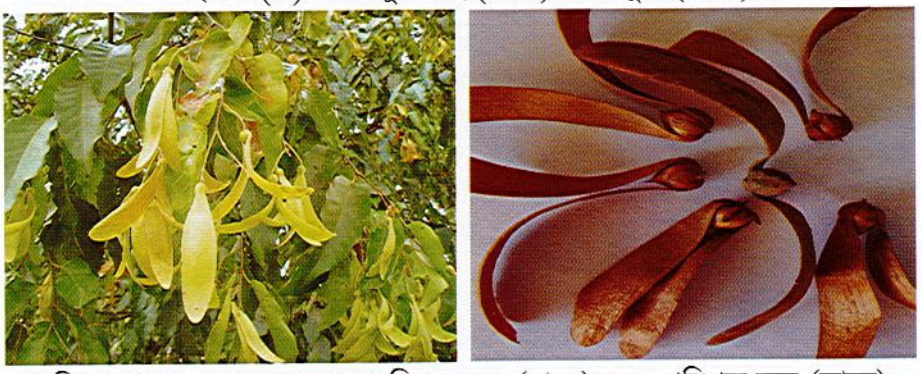

ছবি-৯(খ): তেলসুর গাছের অপরিপক্ক ফল (বামে) এবং পরিপক্ক ফল (ডানে)

ছবি-৯(গ): নার্সারিতে উত্তেলিত তেলসুর চারা

১০ তুন বা সুরুজবেদ

পরিচিতি: তুন (*Toona ciliata*) অঞ্চলভেদে পিয়াতুন, পিও, প্রিয়াস, সুরুজ, সুরুজবেদ (চট্টগ্রাম), কুমা (সিলেট), পোমা (দিনাজপুর), সরজিগা (নিলফামারী), পাউয়া (কুড়িগ্রাম), পোয়া (যশোর), বলেরঙ্গি (ময়মনসিংহ), পানিনিয়া (রাজশাহী), সরবেট (চাকমা), ছিকাদো, তসিতকাদো (মগ), বট-ব্রেত (গারো) ইত্যাদি নামে পরিচিত। বাংলাদেশে তুন একটি বিপন্ন প্রজাতির গাছ। তুন একটি মধু উৎপাদনকারী গাছ হিসেবে পরিচিত।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম,কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলের মিশ্র চিরসবুজ বনের পাহাড়ের ঢালে এবং গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাংগাইল ও দিনাজপুরের পাতাঝরা শাল বনে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো তুনের কতিপয় গাছ রয়েছে। এ ছাড়া গ্রামীণ বনে এবং রাস্তার পাশে এভিনিউ গাছ হিসেবে লাগানো কিছু তুনের গাছ দেখা যায়।

গাছের বিবরণ: তুন মাঝারি থেকে বড় আকৃতির দ্রুত বর্ধনশীল পাতাঝরা বৃক্ষ, উচ্চতায় ২০-৩৫ মিটার এবং গাছের বেড় ১.৮-৩.০ মিটার পর্যন্ত হয়। গুঁড়ি বা প্রধান কান্ড সোজ নলাকার এবং বাকল সাদাটে-ধূসর থেকে বাদামি বর্ণের ও বাকলের উপরিভাগ লম্বালম্বিভাবে ফাটল ও খাঁজযুক্ত। পাতায় ১০-২০টি বর্শাকৃতির পত্রক রয়েছে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে পাতা ঝরে পড়ে। নতুন গজানো পাতা লালচে বর্ণের হয়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে থোকায় থোকায় মিষ্টি ঘ্রাণযুক্ত ছোট ছোট সাদা বর্ণের ফুল ফোটে। ফল ক্যাপসুল আকৃতির ও ফলের আবরণ মসৃণ। মার্চ-এপ্রিল মাসে পরিপক্ক ফল গাঢ় বাদামি বর্ণ ধারণ করে। প্রতিটি ফলে ৩৬-৩৯টি করে বীজ রয়েছে। বীজগুলো বাদামি বর্ণের পাতলা পাখনাযুক্ত। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১,৪০,০০০-১,৫০,০০০টি। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ১ মাস পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: তুনের অসার কাঠ হলদে-বাদামি এবং সার কাঠ ইটা-লাল বর্ণের, নরম, মধ্যম ভারী ও মধ্যম টেকসই। আসবাবপত্র, রিক্সার বডি, চায়ের বক্স, কৃষি কাজের ও গান-বাজনার সরঞ্জাম, দেশীয় নৌকা ও সাম্পান তৈরিতে কাঠের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। এ গাছের ফুল থেকে মধু পাওয়া যায়। এ ছাড়া ফুল থেকে লাল ও হলুদ রং পাওয়া যায় এবং রং দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাপড়কে রঙ্গিন করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে তুন গাছের পাতা রান্না করে সব্জি হিসেবে খাওয়া হয়। ব্যাগ ও থলেসমূহ শক্তকরণে বাকলের ট্যানিন ব্যবহৃত হয়। বাকল থেকে তৈরি টনিক আমাশয় নিরাময় করে।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার: তুন গাছের পরিপক্ক ফল আপনা-আপনি ফেটে গিয়ে হালকা-পাতলা পাখনাযুক্ত বীজগুলো বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত বন এলাকায় বীজ থেকে প্রাকৃতিকভাবে তুন চারা ও গাছ জন্মায়।

নার্সারিতে চারা উৎপাদন: মার্চ-এপ্রিল মাসে সংগৃহীত পরিপক্ক ফল ৩-৫ দিন রোদে শুকালে ফল আপনি-আপনি ফেটে বীজ বের হয়। বীজ সরাসরি ট্রেতে বপন করতে হয়। বীজ বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে চারা গজাতে থাকে। বীজের অঙ্কুরোদগম বা চারা গজানোর হার শতকরা ৫০-৬০ ভাগ। ট্রেতে গজানো চারা ৪-৫ সেন্টিমিটার লম্বা হলে পলিব্যাগে স্থানান্তর করা যায়।

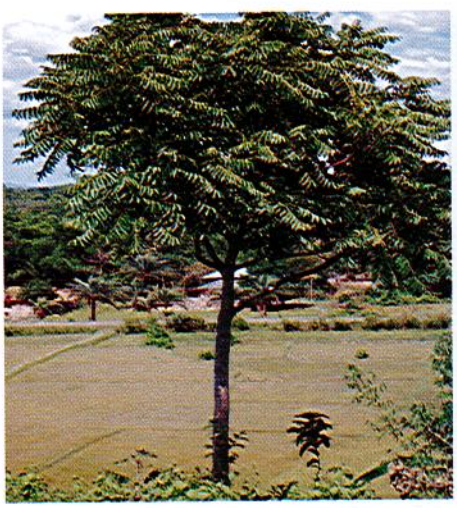
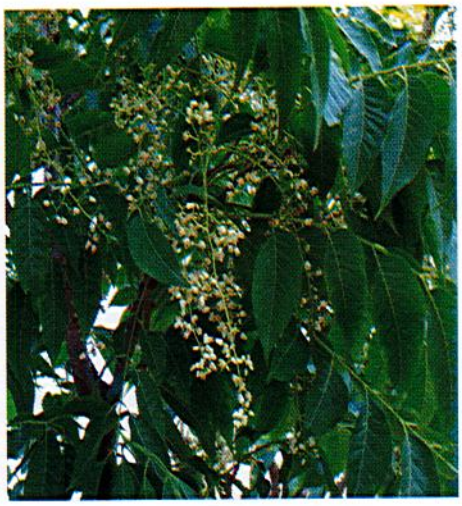

ছবি-১০(ক): তুন গাছ (বামে) এবং গুচ্ছাকার ফুল (ডানে)

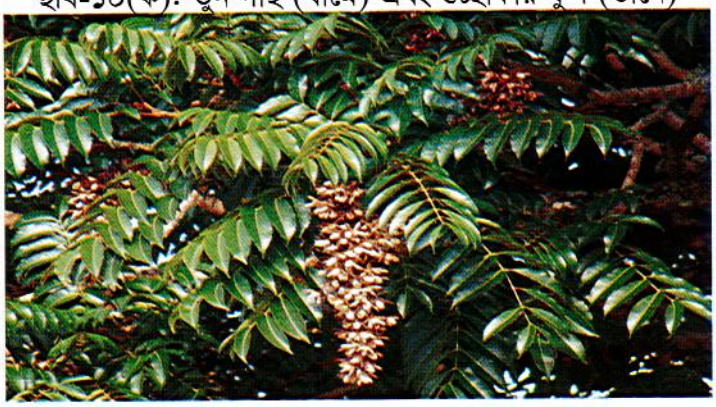

ছবি-১০(খ): তুন গাছের গুচ্ছাকার পরিপক্ক ফল (ফেটে যাওয়ায় বীজ ছড়িয়ে পড়ে)

ছবি-১০(গ): তুন গাছের পরিপক্ক ফল (বামে) এবং বীজ (ডানে)

১১ ধারমারা

পরিচিতি: ধারমারা (*Stereospermum colais*) অঞ্চলভেদে ধারমারা (চট্টগ্রাম), বারুল-জাতা, আটকাপালি, বেরেঙ্গা (সিলেট), সিকুয়াই (চাকমা), গোদা-কামারাং (মগ), বলসাল, বটসিল (গারো), চাইন-চা (গারো) ইত্যাদি নামে পরিচিত। বাংলাদেশে ধারমারা একটি বিপন্ন প্রজাতির গাছ। এ গাছের কাঠে সিলিকা থাকায় কাঠ কাটার যন্ত্রপাতির ধার নষ্ট হয়ে যায় বিধায় নামকরণ হয়েছে ধারমারা।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলের মিশ্র চিরসবুজ বনের পাহাড়ের ঢালুতে এবং গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও টাংগাইলের পাতাঝরা শাল বনে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো কতিপয় ধারমারা গাছ দেখা যায়।

গাছের বিবরণ: ধারমারা মাঝারি থেকে বড় আকৃতির পাতাঝরা বৃক্ষ, উচ্চতায় ২০-২৫ মিটার পর্যন্ত হয়। প্রধান কান্ড সোজা নলাকার এবং একাধিক গভীর খাঁজ ও ভাঁজ দেখা যায়। বাকল হলুদাভ বা ছাই-ধূসর বর্ণের এবং বাকলের উপরিভাগে আড়াআড়ি অগভীর খাঁজ রয়েছে। পাতা ৩-৫ জোড়া পত্রকযুক্ত। পত্রকগুলো উপবৃত্তকার, কিনারা মসৃণ ও আগা সূচালো। এপ্রিল-মে মাসে ঘন্টাকৃতি এবং সুঘ্রাণ বিশিষ্ট ফুল ফোটে। ফল অনেকটা সাজনা ফলের মতো লম্বাটে, চারকোণা বিশিষ্ট এবং একটু মোচড়ানো। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে পরিপক্ক ফল বাদামি বর্ণের হয়। বীজ ঝিলিময় পর্দার ন্যায় পাতলা পাখনাযুক্ত। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ৭৫,০০০-৮০,০০০টি। বীজের আয়ুষ্কাল এবং সংরক্ষণকাল প্রায় ৫-৬ মাস।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: ধারমারার কাঠ ধূসর বাদামি বর্ণের, অত্যন্ত শক্ত, মজবুত এবং টেকসই। কাঠে সিলিকা থাকায় কাঠ কাটার যন্ত্রপাতির ধার নষ্ট হয়ে যায়। ঘরের খুঁটি ও গৃহ নির্মাণসহ অন্যান্য কাজে কাঠ ব্যবহার করা হয়।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার: ধারমারার পরিপক্ক ফল আপনা-আপনি ফেটে গিয়ে হালকা-পাতলা পাখনাযুক্ত বীজগুলো বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। বন এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে বীজ থেকে ধারমারার চারা ও গাছ জন্মায়। এ গাছ কপিচিং ক্ষমতা সম্পন্ন অর্থাৎ কর্তনকৃত গাছের গোড়া বা মোথা থেকে প্রাকৃতিক-ভাবে একাধিক কুশি বা চারা জন্মায় এবং পর্যায়ক্রমে বড় গাছে পরিণত হয়।

নার্সারিতে চারা উৎপাদন: ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সংগৃহীত পরিপক্ক ফল ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ফল থেকে বীজ আলাদা করা হয়। বীজ সরাসরি ট্রেতে বা পলিব্যাগে বপন করতে হয়। বীজ বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে চারা গজাতে থাকে। বীজের অঙ্কুরোদগম বা চারা গজানোর হার শতকরা ৬০-৭০ ভাগ। ট্রেতে গজানো চারা ৪-৫ সেন্টিমিটার লম্বা হলে পলিব্যাগে স্থানান্তর করা হয়।

ছবি-১১ (ক): ফলসহ ধারমারা গাছ (বামে) এবং পাতা (ডানে)

ছবি-১১ (খ): ধারমারা গাছের ফুল (বামে) এবং বীজ (ডানে)

১২ নারিকেলি বা বুদ্ধু নারিকেল

পরিচিতি: নারিকেলি (*Pterygota alata*) অঞ্চলভেদে বুদ্ধু নারিকেল, নারিকেলী (চট্টগ্রাম), কাঠ বাদাম (রংপুর), কুফালা (চাকমা), কাশ্মিরি বাদাম ইত্যাদি নামে পরিচিত। বাংলাদেশে বুদ্ধু নারিকেল একটি বিপন্ন প্রজাতির দুর্লভ গাছ। ২০১২ সালের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনে বুদ্ধু নারিকেল গাছ রক্ষিত উদ্ভিদ হিসেবে অভিহিত।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বনাঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মানো বুদ্ধু নারিকেলের কদাচিৎ গাছ দেখা যায়। এ ছাড়া উঁচু এভিনিউ গাছ হিসেবে ঢাকার রমনা পার্ক, বলধা গার্ডেন, মিরপুর জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি প্রাঙ্গন ও দিলকুশা সংলগ্ন রাষ্ট্রপতির অফিস বঙ্গভবন এলাকায় লাগানো বেশ কিছু বুদ্ধু নারিকেল গাছ রয়েছে। এ ছাড়া বুদ্ধু নারিকেল গাছের বিস্তৃতি রয়েছে রংপুর জেলা শহরে।

গাছের বিবরণ: বুদ্ধু নারিকেল বেশ বড় আকৃতির পাতাঝরা বৃক্ষ, উচ্চতায় ৩০-৫০ মিটার এবং গাছের বেড় প্রায় ২ মিটার পর্যন্ত হয়। গুঁড়ি কান্ড সোজা নলাকার এবং প্রায় ১০-২০ মিটার পর্যন্ত ডালপালা বিহীন। গাছের গোড়ায় ঠেসমূল রয়েছে। বাকল মসৃণ, পুরু ও ধূসর-বাদামি বর্ণের। পাতা তাম্বুলাকার, দেখতে পান পাতার মতো এবং পাতাগুলো ঘনবদ্ধভাবে বিন্যস্ত। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে পাতা ঝরে পড়ে এবং মার্চ মাসে নতুন পাতা গজায়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে আলাদাভাবে থোকায় থোকায় বাদামি-হলুদ বর্ণের পুরুষ ও স্ত্রী ফুল ফোটে। ফুল দুর্গন্ধযুক্ত এবং পাপড়ির বাহিরের দিক বাদামি কিন্তু ভিতরের দিক লাল রঙের। ফল বড়, কাষ্ঠল, ডিম্বাকার এবং গুচ্ছাকারে সজ্জিত থাকে। এপ্রিল-জুন মাসে পরিপক্ক ফল গাঢ় বাদামি বর্ণ ধারণ করে। প্রতিটি ফল ২৫-৩০টি বীজযুক্ত এবং বীজগুলো পাতলা পাখনাযুক্ত। পরিপক্ক ফল আপনা-আপনি ফেটে বীজগুলো বাতাসের সাহায্যে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ৭০০-৮০০টি। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ১৫-২০ দিন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: বুদ্ধু নারিকেল কাঠ সাদাটে বর্ণের, হালকা ও আঁশযুক্ত যা কাগজ তৈরির পাল্প হিসেবে বিবেচিত। কাঠ নিম্ন মানের হওয়ায় বক্স, ভিনিয়ার, প্লাইউড, দিয়াশলাই ও খেলনা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে আফিমের বিকল্প হিসেবে বীজ ব্যবহার করা হয়। বীজ থেকে সংগৃহীত তেল প্রদীপ জ্বালাতে ব্যবহার করা হয়। অনেক দেশে বীজ রান্না করে খায়। বীজের শাঁস ভক্ষণীয় এবং খেতে ও স্বাদে অনেকটা নারকেলের মতো।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার: সাধারণত বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে বুদ্ধু নারিকেলের বীজ থেকে চারা জন্মায় ও বংশ বিস্তার হয়।

নার্সারিতে চারা উৎপাদন: নার্সারিতে সংগৃহীত বীজ এক সপ্তাহের মধ্যে পলিব্যাগে বপন করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম বা চারা গজানোর হার শতকরা ৫০-৬০ ভাগ। চারা গজাতে সময় লাগে ৮-১০ দিন।

ছবি-১২ (ক): নারিকেলি গাছ (বামে) এবং গাছের গোড়াতে ঠেসমূল (ডানে)

ছবি-১২ (খ): নারিকেলি গাছের ফুল (বামে) এবং ফল (ডানে)

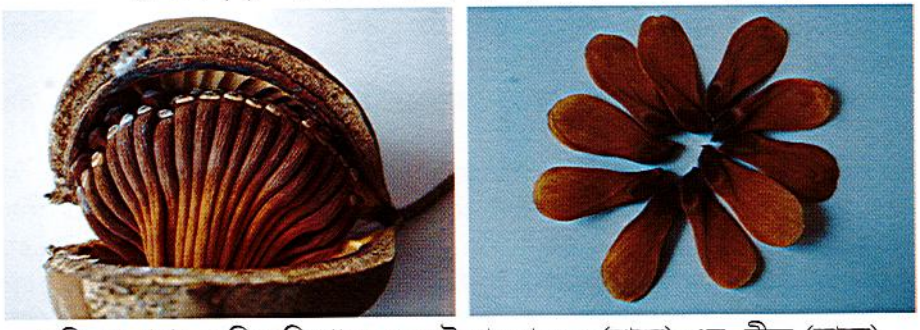

ছবি-১২ (গ): নারিকেলি গাছের ফেটে যাওয়া ফল (বামে) এবং বীজ (ডানে)

১৩ বান্দরহোলা

পরিচিতি: বান্দরহোলা (*Duabanga grandiflora*) অঞ্চলভেদে কাচা (চট্টগ্রাম), ইয়াম্পাতি, রামদালু, রামদালা (সিলেট), কাহদুলা-জারুল (কক্সবাজার), বাইছুয়া, খ্রিছিয়া (মগ), বলছহিম (গারো) ইত্যাদি নামে পরিচিত। বাংলাদেশে বান্দরহোলা একটি সংকটাপন্ন দেশীয় প্রজাতির গাছ। বন উজাড়, আবাসস্থল ধ্বংস ও অতিরিক্ত গাছ আহরণের ফলে বান্দরহোলা প্রজাতির অস্তিত্ব হুমকিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান: বান্দরহোলা গাছ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট বনাঞ্চলের পাহাড়ের পাদদেশে, ভেজা মাটিযুক্ত স্থানে এবং নদী-নালার কিনারাতে ভালো জন্মায়। ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে লাগানো বান্দরহোলার কিছু গাছ রয়েছে।

গাছের বিবরণ: বান্দরহোলা বড় আকৃতির প্রশস্ত ডালপালায় বিস্তৃত দ্রুত বর্ধনশীল চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ২৫-৪০ মিটার এবং গাছের বেড় প্রায় ১.৫ মিটার পর্যন্ত হয়। গুঁড়ি বা প্রধান কান্ড সোজা এবং নলাকার। লম্বা ডালপালার আগা নিম্নমুখীভাবে ঝুলে থাকে। বাকল পুরু, অমসৃণ, হালকা বাদামি বর্ণের এবং বহিরাবরণ আড়াআড়িভাবে ফাটলযুক্ত ও পাতলা স্তর খসে পড়ে। পাতা বড় আকারের, দেখতে অনেকটা চাকু বা ছুরির মতো এবং পাতাগুলো দুই সারিতে সজ্জিত। কচি পাতা লালচে বর্ণের হয়। পাতার কিনারা মসৃণ এবং আগা সূচালো। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ঝুলে থাকা ডালপালার মাথায় থোকায় থোকায় বড় আকারের সাদা বর্ণের ফুল ফোটে। ফুলগুলো রাত্রে ফোটে এবং অপ্রীতিকর ঘ্রাণ ছড়ায়। ফল চ্যাপ্টা গোলাকার অনেকটা আপেল আকৃতির এবং প্রসারিত স্থায়ী বৃতিযুক্ত। এপ্রিল-মে মাসে পরিপক্ক ফল কালচে বর্ণ ধারণ করে। প্রতি ফলে অনেক বীজ থাকে। বীজগুলো কালো বর্ণের ক্ষুদ্র আকৃতির এবং লম্বা সূচালো লেজযুক্ত। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা আনুমানিক ২৪ লক্ষ। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ১ বছর পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: বান্দরহোলার কাঠ হালকা ধূসর থেকে বাদামি বর্ণের, মধ্যম শক্ত, হালকা এবং টেকসই। কাঠ দিয়ে দিয়াশলাই কাঠি ও বক্স, চায়ের প্যাকিং বক্স, ব্লাক বোর্ড, প্লাইউড, গৃহ ও নৌকা নির্মাণ এবং কাগজ তৈরির মন্ড বানানো হয়। কচি ফল টক স্বাদযুক্ত ও ভক্ষণীয় এবং পানীয় তৈরি করে পান করা হয়। এ ছাড়া ফল সেদ্ধ করে সব্জিরূপে খাওয়া যায়। ফল ও পাতা সেদ্ধ করে কালো রঙ তৈরি করা হয়।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার: সাধারণত বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে বান্দরহোলার বীজ থেকে চারা জন্মায় ও বংশ বিস্তার হয়।

নার্সারিতে চারা উৎপাদন: এপ্রিল-মে মাসে সংগৃহীত বান্দরহোলার ফল ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে কাপড়ের উপর রেখে আস্তে আস্তে লাঠির আঘাতে ক্ষুদ্র আকৃতির বীজগুলো বের করা হয়। নার্সারিতে বীজগুলো ট্রেতে বপন করতে হয় এবং ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে চারা গজানো সম্পন্ন হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম বা চারা গজানোর হার শতকরা ২৫-৩০ ভাগ। দুই জোড়া পাতা বিশিষ্ট চারাগুলো ট্রে থেকে তুলে পলিব্যাগে লাগানো হয়।

ছবি-১৩ (ক): বান্দরহোলা গাছ (বামে), ঝুলন্ত পাতা (উপরে) ও গুচ্ছাকারে ফুল (নিচে)

ছবি-১৩ (খ): বান্দরহোলা গাছের পাকা ফল (বামে) এবং দানাদার বীজ (ডানে)

১৪ বৈলাম

পরিচিতি: বৈলাম (*Anisoptera scaphula*) বা বইলাম নামে পরিচিত। আর্ন্তজাতিক সংস্থা IUCN (বাংলাদেশ) -এর লাল তালিকায় বিশ্বব্যাপী তথা বাংলাদেশে বৈলাম একটি মহাবিপন্ন প্রজাতির গাছ। ২০১২ সালের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনে বৈলাম গাছ রক্ষিত উদ্ভিদ হিসেবে অভিহিত। বর্তমানে বৈলাম গাছ দুস্প্রাপ্য এবং বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলের চিরসবুজ ও মিশ্র চিরসবুজ বনে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো অল্প সংখ্যক বৈলাম গাছ রয়েছে। বৈলামের বিস্তৃতি রয়েছে দক্ষিণ কক্সবাজার বন বিভাগের সাপলাপুর ও সিলখালি বন বীট এলাকায়। এ ছাড়া প্রাকৃতিক ভাবে জন্মানো বৈলাম গাছ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে চট্টগ্রামের হাজারিখিল, রাঙ্গামাটির সীতা পাহাড় ও দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে।

গাছের বিবরণ: বৈলাম বড় আকৃতির চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ৩০-৪৫ মিটার এবং গাছের বেড় ১২০-১৪৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। এ গাছের বৃদ্ধি ধীর গতি সম্পন্ন। গাছের গোড়াতে ঠেসমূল রয়েছে। গুঁড়ি বা প্রধান কান্ড সোজা নলাকার এবং প্রায় ২০ মিটার পর্যন্ত ডালপালা বিহীন। বাকল মসৃণ ও হালকা ধূসর বর্ণের। পাতা আয়তাকার, কিনারা মসৃণ এবং আগা সূচালো। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে সাদা বর্ণের ফুল ফোটে। ফলের শীর্ষভাগে লম্বাটে দুটি পাতলা পাখনা সংযুক্ত থাকে। মে-জুন মাসে পরিপক্ক ফল গাঢ় বাদামি বর্ণের হয়। পাকা ফল বৃন্তচ্যুত হলে ফলের পাখনায় বাতাস লেগে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি ফল ১-২ বীজ বিশিষ্ট। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১০০-১৫০টি। বীজের আয়ুষ্কাল খুবই কম। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বীজ ৭-১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: কাঠ হালকা হলুদাভ থেকে হালকা বাদামি বর্ণের, শক্ত, মজবুত এবং টেকসই। হালকা নির্মাণ কাজসহ গৃহ নির্মাণে, ফ্লোরিং, ঘরের সিলিং ও পানেলিং, ভিনিয়ার, আসবাবপত্র, জলযান ও যানবাহনের বডি নির্মাণে কাঠ ব্যবহৃত হয়।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার: সাধারণত বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে বৈলামের বীজ থেকে চারা জন্মায় ও বংশ বিস্তার হয়।

নার্সারিতে চারা উৎপাদন: বীজের আয়ুষ্কাল খুবই কম বিধায় নার্সারিতে পলিব্যাগে ২-৩ দিনের মধ্যে বীজ বপন করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম বা চারা গজানোর হার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ এবং ৫-৭ দিনের মধ্যে চারা গজানো সম্পন্ন হয়।

ছবি-১৪ (ক): বৈলাম গাছ (বামে) এবং পাখনাযুক্ত ফল (ডানে)

ছবি-১৪ (খ): নার্সারিতে উত্তোলিত বৈলাম চারা

১৫ সিভিট বা আম চুন্ডুল

পরিচিতি: সিভিট (*Swintonia floribunda*) অঞ্চলভেদে আম চুন্ডুল, মইলাম,মইলাম-চিবুক (চট্টগ্রাম), আম বারোলা, বইলসুর, সিবিকা (চাকমা), সামবাং, সাংগ্রিন (মগ) নামে পরিচিত। বাংলাদেশে সিভিট একটি অতি বিপন্ন দুর্লভ ধরনের গাছ। সিভিট গাছ বিপন্ন ভাদি হাঁসের (White Wing Duck) বসতি ও আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। সিভিট গাছের বিপন্নতার সাথে বিপন্ন ভাদি হাঁসের অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান: এক সময় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়, রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় এবং পাবলাখালী বন এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো প্রচুর সিভিট গাছ ছিল। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের পাহাড়ি বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো স্বল্প সংখ্যক সিভিট গাছ বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যায়। মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের সাতগাঁও চা বাগানে লাগানো ১৮-১৯টি সিভিট গাছ রয়েছে। সীতাকুন্ড উদ্ভিদ উদ্যানে, ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে লাগানো কতিপয় সিভিট গাছ রয়েছে।

গাছের বিবরণ: সিভিট বৃহৎ আকৃতির চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ৪৫-৫০ মিটার এবং গাছের বেড় ৫-৭ মিটার পর্যন্ত হয়। গাছের গোড়ার অংশে সচরাচর ২ মিটার বা অধিক উচ্চতার ঠেসমূল দেখা যায়। গুঁড়ি বা প্রধান কান্ড সোজা, নলাকার এবং প্রায় ২০ মিটার পর্যন্ত ডালপালা বিহীন। বাকল মসৃণ, ধূসর বর্ণের এবং বাকলের উপরিভাগে লম্বালম্বি অগভীর ফাটল ও খাঁজ রয়েছে। পাতা দেখতে অনেকটা আম পাতার মতো, কিনারা মসৃণ এবং আগা সূচালো। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে হালকা হলুদাভ বর্ণের ফুল ফোটে। ফল ড্রুপ জাতীয়। ঝুলন্ত অপরিপক্ক ফলগুলো ৫টি পাতা সদৃশ বৃত্যাংশের উপর বিন্যস্ত। ফল ছোট পাখনাযুক্ত। এপ্রিল-মে মাসে পরিপক্ক ফল বাদামি বর্ণের হয়। ফল একক বীজ বিশিষ্ট। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা প্রায় ৭৫০-৮০০টি। বীজের আয়ুস্কাল কম। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বীজ ৭-১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: সার কাঠ হালকা ধূসর বর্ণের, মধ্যম ভারী ও শক্ত, তবে তেমন টেকসই নয়। গুঁড়ি কান্ড খুঁড়ে দেশীয় ডিঙ্গি নৌকা তৈরি করা হয়। জাহাজ ও নৌকাতে পাল তোলার কাজে, চায়ের বক্স, দিয়াশলাই কাঠি ও বক্স, ব্লাক বোর্ড, ভিনিয়ার ও প্লাইউড, ফ্লাশ ডোর ও দরজা-জানালার ফ্রেম তৈরিতে কাঠ ব্যবহার করা হয়। সিভিট পাতা জ্বর, ডায়রিয়া ও দাঁতের ব্যাথা নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। কাঁচা ফল খাওয়া যায়।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার: বন এলাকায় সিভিটের অপ্রতুল মাতৃ বৃক্ষ ও অপ্রতুল বীজের কারণে প্রাকৃতিকভাবে তেমন সিভিট গাছ জন্মাচ্ছে না।

নার্সারিতে চারা উৎপাদন: নার্সারিতে এপ্রিল-মে মাসে সংগৃহীত বীজ ২-৩ দিনের মধ্যে পলিব্যাগে বপন করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম বা চারা গজানোর হার শতকরা ৫০-৬০ ভাগ। বীজের চারা গজাতে সময় লাগে ৫-৭ দিন।

ছবি-১৫(ক): সিভিট গাছ (বামে) এবং ফুল (উপরে) ও পাখনাযুক্ত অপরিপক্ক ফল (নিচে)

ছবি-১৫(খ):পরিপক্ক ফল (বামে) এবং অংকুরিত বীজ (ডানে)

গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় বৃক্ষ প্রজাতির চাষ পদ্ধতি

দেশীয় বৃক্ষ প্রজাতিগুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে সংরক্ষণার্থে কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকায় চারা লাগিয়ে বাগান সৃজনের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা যেতে পারে। নিম্নে চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো যথাক্রমে -

(ক) চাষের উপযুক্ত জমি: সুনিষ্কাশিত বেলে-দোআঁশ মাটি দেশীয় বৃক্ষ প্রজাতিগুলো চাষের জন্য বেশ উপযোগী। নির্বাচিত রৌদ্রময় জমিতে ২-৩টা চাষ দিয়ে মাটি আলগা করে ও আগাছা পরিষ্কার করে বিঘা প্রতি ৪ টন গোবর ও জৈব সার ভালোভাবে মেশাতে হবে। এরপর জমিতে মই দিয়ে মাটি সমান করে নিতে হবে। পাশাপাশি পানি নিষ্কাশনের জন্য নালার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

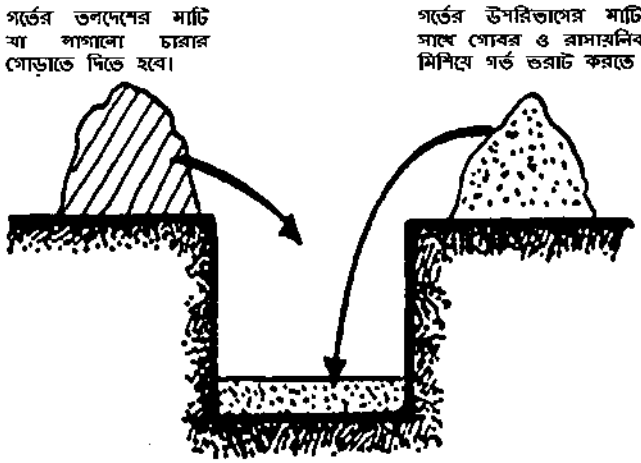

ছবি-১৬: ডান অংশে গর্তের উপরিভাগের মাটি এবং বাম অংশে গর্তের তলদেশের মাটি

(খ) রোপণ প্রক্রিয়া: বন এলাকায় বা বসত বাড়ি বা পতিত জমিতে দেশীয় বৃক্ষ প্রজাতিগুলোর চাষ করা যায়। বর্ষার শুরুতে জুন-জুলাই মাসে ১ বছর বয়সী চারা লাগানো হয়। বন এলাকায় বাগান সৃজনের ক্ষেত্রে চারা থেকে চারা ২ মিটার (৬ ফুট) এবং সারি থেকে সারি ২ মিটার (৬ ফুট) দূরত্ব হিসেবে প্রতি হেক্টরে ২,৫০০টি চারা লাগাতে হয়। অন্যান্য স্থানের ক্ষেত্রে চারা লাগানোর দূরত্ব নির্ভর করে গাছের গুরুত্ব ও ব্যবহারের উপযোগী অনুযায়ী। গর্তের সাইজ হবে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতায় ১ হাত বা ৪৫ সেন্টিমিটার করে। খননকৃত গর্তের মাটিকে দু'ভাগে (ডান অংশে গর্তের উপরিভাগের মাটি এবং বাম অংশে গর্তের তলদেশের মাটি) রেখে দিতে হবে। চারা লাগানোর দু'সপ্তাহ আগে ডান অংশে রক্ষিত গর্তের উপরিভাগের মাটির সাথে পরিমাণ মতো পচা গোবর এবং রাসায়নিক সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। অতঃপর দু'সপ্তাহ পরে পলিথিন ব্যাগ ছিড়ে চারাটি গর্তের মাঝে রোপণ করতে হবে। রোপণকৃত চারার গোড়াতে উপরে রেখে দেয়া গর্তের তলদেশের মাটি একটু উঁচু করে ঢাল রেখে মাটি চেপে দিতে হবে যাতে প্রচুর বৃষ্টিপাতে চারার গোড়াতে পানি জমে থাকতে না পারে।

(গ) রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা: ঝড়ো বাতাসের হাত থেকে চারা গাছ রক্ষার্থে রোপণকৃত চারার গোড়াতে বাঁশের কাঠি পুতে সুতলি দিতে চারাকে বেঁধে দিতে হবে। এছাড়া গবাদি পশু বা বন্য জীবজন্তুর উপদ্রব থেকে চারা গাছ রক্ষার্থে বাগানের চারিধারে বাঁশের বেড়া বা লাগানো চারাকে বাঁশের খাঁচা দিতে হবে। চারার গোড়াতে জন্মানো আগাছা নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে। খরাকালীন পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে এবং চারার গোড়াতে শুকনো খড়-কুটা দিয়ে মালচিং (mulching) করতে হবে। জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে নালা কেটে পানি নিষ্কাশন করতে হবে। সৃজিত বাগানের সমগ্র এলাকায় ১ম বছরে ৩ বার, ২য় বছরে ২ বার এবং পরবর্তী বছরগুলোতে ১ বার করে আগাছা ও জঙ্গল কেটে দিতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ বা গাছের রোগাক্রান্ত অংশ ও মরা ডালপালাগুলো ছাঁটাই করে দিতে হবে। গাছের ঘনত্ব দেখা দিলে সারি থেকে দুর্বল গাছগুলো কেটে ফেলে আয়তনের বিস্তৃতি বাড়াতে হবে। এতে করে গাছগুলো মজবুতভাবে দ্রুত বেড়ে ওঠবে।

(ঘ) রোপণ পরবর্তী সার প্রয়োগ: বর্ষার পূর্বে এবং বর্ষার পরে দু'দফায় ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০ গ্রাম টিএসপি এবং ৫ গ্রাম এমপি রাসায়নিক সার চারার গোড়া থেকে ১ হাত দূরবর্তী স্থানের চারিধারে ৬ ইঞ্চি গভীর নালা কেটে প্রয়োগ করে মাটি দিয়ে নালা ভরাট করতে হবে এবং প্রয়োজনে পানি সেচ দিতে হবে। তবে চারা গাছের বৃদ্ধির পাশাপাশি রাসায়নিক সারের পরিমাণ এবং প্রয়োগকৃত স্থানের দূরত্ব বাড়াতে হবে।

(ঙ) রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থা: বাগানে লাগানো দেশীয় বৃক্ষ প্রজাতিগুলোর গাছে ছত্রাক বা অন্যান্য রোগের প্রকোপ দেখা গেলে সেক্ষেত্রে ১:৪ অনুপাতে নিমের খৈল বা নিম পাতার রস পানির সাথে মিশিয়ে রোগাক্রান্ত গাছে স্প্রে করতে হবে।